লিপির উৎপত্তি : প্রসঙ্গকথা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

[সারসংক্ষেপ : লিপি ছাড়া মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। লিপিহীন যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে ইশারা, ইঙ্গিত ও শ্রুতির উপরই মানুষ নির্ভর করতো। লিপি সৃষ্টি মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। চিত্রলিপি থেকে ভাবলিপি ও পরবর্তীকালে শব্দলিপির উদ্ভব ঘটে। একটি বিশেষ ভাষার প্রতিটি শব্দের জন্য বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার করা হতো। এই চিহ্নই পরবর্তীপর্যায়ে লিপি নির্দেশক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। লিপির উৎপত্তির ক্ষেত্রে হায়রোগ্লিফিক, কিউনিফর্ম, ক্রিটান, ফিনিশিয়ান এবং আরো অনেক লিপি একেক সময় প্রথম লিপি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি লিপিধৃত হওয়ায় মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে।]

মানুষের জীবনযাপনের রূপ ও প্রকৃতি বিচিত্র। সভ্যতার আদিকাল থেকে এই বিচিত্র-রূপী জীবন উপভোগের জন্য মানুষ নানাবিধ সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিন্তার জগতকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকে স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আদি মানব পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য প্রথম যে ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল, তাই সভ্যতার আদি শিল্প। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা, জীবন-বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়াবলী প্রকাশ করতে চায়। সভ্যতার উষালগ্নে ভাষা প্রচলনের পূর্বে মানুষের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি।

লিপি আবিষ্কারের পূর্বে শ্রুতি বা শোনার উপরই মানুষ নির্ভর করতো। বংশ পরম্পরায় তারা পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বাহ করতো। লিপি সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। লিপি শব্দের আভিধানিক অর্থ–চিঠি, লিখন, লেখা, অক্ষর, বর্ণমালা; alphabet। উৎপত্তি শব্দের আভিধানিক অর্থ–উদ্ভব, জন্ম, আবির্ভাব, অভ্যুদয়। অর্থাৎ, লিপির উৎপত্তি বলতে, বর্ণমালার জন্ম বা অভ্যুদয় বলা যেতে পারে। মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্য লিখিত, খোদিত বা অঙ্কিত যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকেই লিপি বলা হয়। লিপি শব্দের উদ্ভব হয়েছে, লিপ্ ধাতুর সঙ্গে -ই প্রত্যয় যোগ করে (লিপ+ই= লিপি)। ভারতীয় ব্যাকরণবিদগণের মতে, 'লেপন করা' থেকে 'লিপি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য, ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, 'দিপি' শব্দ থেকে 'লিপি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 'দিপি' শব্দের অর্থ, ছেদন, খণ্ডন। খরোষ্ঠী অক্ষরে 'দিপি' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়াও, লিপি শব্দের সমার্থক শব্দ যেমন, লিবি, লিপি, লিবী, লিপিকা, লেখা, অক্ষরসংস্থান, অক্ষরবিন্যাস, অক্ষর-রচনা প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে লিপি শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে লিবি, লেখনী, মসি, বর্ণ, অক্ষর, যবনানী (যবনাদের লিপি) প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে (কল্পনা, ১৯৯২ : ১)।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

লিপির উৎপত্তি নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করেছেন। বাঙালিদের মধ্যে R.D. Banerji, *The Origin of Bengali Script* (1919) এবং, S.K. Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* (1926) গ্রন্থে বাংলা লিপির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা* (সমাজদার, অনু. ১৯৮৯), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (২০১২), প্রমুখ লিপির উৎপত্তি নিয়ে কাজ করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষকালে লিপির উৎপত্তি নিয়ে আগ্রহ ও গবেষণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। লিপি সৃষ্টির সাথে মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিষয় জড়িত। বর্তমানকালের নব নব আবিষ্কার লিপির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। লিপির উদ্ভব, লিখন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়াবলী মানব মনন-বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। লিপি নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও লিপির ইতিহাস নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এ প্রবন্ধে, লিপির উৎপত্তি অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২.

মানব সভ্যতার ইতিহাসে লিপি আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লিপির উদ্ভব একদিনে হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে মানুষ লিপি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ গুহার দেয়ালে বা প্রস্তর ফলকে কোনো বস্তু বা ঘটনা দেখলে তার ছবি এঁকে রাখত (কাইউম, ২০০০ : ১৫১)। মানুষ বাগ্‌যন্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে এলেও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে বহুকাল সময় লেগেছিল। প্রাথমিকভাবে অঙ্গভঙ্গি, আকার-ইঙ্গিতই ছিল মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম। বহুকালের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ ধ্বনি উচ্চারণ করতে পেরেছে। তারপর সেই ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, ভাষা ও লিপি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৪৩)। লিপি হলো ভাষা ধরে রাখার প্রতীক, চিহ্ন, আধার বা পাত্র। বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্ট ধ্বনি দেখা যায় না, শোনা যায়। তেমনিভাবে মানব মনের অব্যক্ত ভাব দেখা যায় না; অব্যক্ত ভাব ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। প্রকাশিত ভাব ধরে রাখার জন্য, লিপির প্রয়োজন হয়।

ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। অর্থপূর্ণ ভাষা ছাড়া মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের যত সৃষ্টি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভাষা ও লিপি সৃষ্টি। পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না, তখন ভাষা কিংবা লিপি কিছুই ছিল না। ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালের পঞ্চম বিভাগ (era) সিনোযোয়িক (Cenozoic, Greek. kajnos 'নতুন'+zoe 'জীবন') যুগের প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্যালিওসিন উপযুগে বৃক্ষবাসী (arboreal) প্রাচীন প্রসিমিয়ান (Prosimian) প্রাইমেট থেকে ধীরে ধীরে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণের বিবর্তন হতে থাকে। ইউসিন যুগ (৫৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) ও অলিগোসিন (৪৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) উপযুগের মধ্যবর্তীকালে প্রসিমিয়ান থেকে মানব ও হোমিনয়েড প্রাণীর বিকাশ ঘটে এবং এই হোমিনয়েড থেকে পরবর্তীসময়ে মায়োসিন উপযুগে পর্যায়ক্রমে অলিগোপিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস ও হোমিনিড প্রজাতির রামাপিথেকাস, এবং অস্ট্রেলোপিথেকাস নামক প্রাণীর বিকাশ ঘটে। যদিও অস্ট্রেলোপিথেকাস প্রাণীকে বিজ্ঞানীরা আধা-মানব এবং আধা-পঞ্জিডি বলে মনে করেন। অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে হোমো ইরেক্টাসের উদ্ভব ঘটে। প্রায় ৭০ হাজার বছর পূর্বে হোমো ইরেক্টাস থেকে নিয়াণ্ডারথাল-এর

বিকাশ ঘটে, এবং আনুমানিক ৩৫ হাজার বছর আগে হোমো ইরেক্টাস থেকে আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সের (Homo Sapiens) উদ্ভব ঘটে, যাদের মগজের পরিমাণ প্রায় ১২০০-১৬০০ সিসি এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে গুণগতভাবে উন্নততর। তাদের স্বাধীন হস্তচালন ও দ্বি-পদচারণ ক্ষমতা এবং কণ্ঠনালিতে ফেরিন্‌জিয়েল গহবরের (Pharyngeal Cavity) উপস্থিতি আছে, যা অন্য কোনো প্রাণীর ছিল না। শ্বাসনালি ও খাদ্যনালির সংযুক্তির কারণে মানুষ বিভিন্ন রকমের স্বর উচ্চারণ ও উৎসরণে সক্ষমতা রাখে (আলা উদ্দিন, শায়লা, ২০১৬ : ৬২–৬৩)। মোটকথা, বাগ্‌যন্ত্র থাকার জন্যই মানুষ কথা বলতে পারে। পাশাপাশি মানুষের চিন্তা শক্তি আছে, যা অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের মনে নানারূপ ভাবের উদয় হলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল না। মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত করার আগ্রহের কারণেই বাগ্‌যন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল। বাগ্‌যন্ত্র উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষ কাছাকাছি বা দূরের ব্যক্তির নিকটও মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছে।

৩.

প্রত্যেক শব্দের সাথে প্রকাশ্যভাবেই থাকুক বা অপ্রকাশ্যভাবেই থাকুক বাক্য জড়িত থাকে (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২০–২১)। মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক তৃষ্ণা মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, প্রকৃতির উপর ভাগ্যকে সমর্পণ না করে, মেধা ও মনন কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। এই আবিষ্কার তৃষ্ণা তাকে স্রষ্টার আসনে ঠাঁই দিয়েছে। যে কোনো সৃষ্টির বিষয়গুলো মানুষ চিত্র চিহ্ন, প্রতীক বা লিপি ফলকের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। প্রাচীনকালে কখন কোথায় কীভাবে প্রথম লিপির উদ্ভব হয়েছিল, তা বলা না গেলেও, প্রায় দশ হাজার বছরেরও পূর্বে মানুষ প্রস্তর ফলক ও গুহার গায়ে নানা চিত্র অঙ্কিত বা খোদিত করে রাখতো।



(চিত্র-১)

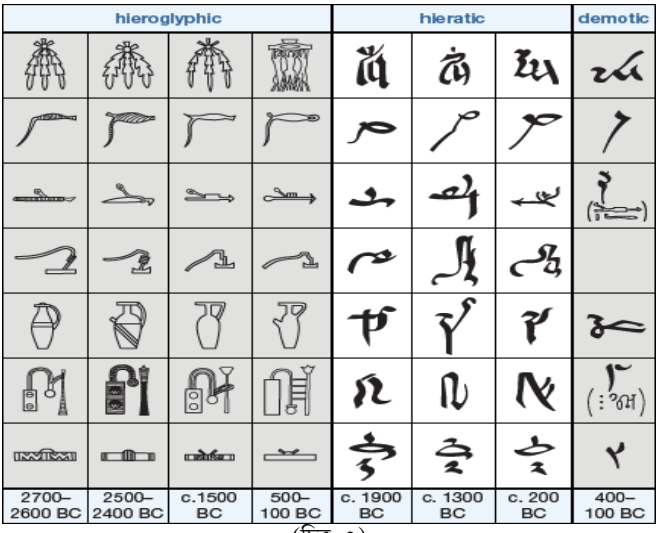
উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী এবং প্রাচীন মিশরবাসীদের মধ্যে চিত্র লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। বর্ণের ব্যবহার যুক্ত আধুনিক লিখন প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় ধ্বনি-

বিশ্লেষণের বিষয়টিও অনুপস্থিত ছিল। চিত্রলিপি পদ্ধতিতে প্রতিটি চিত্র কোনো বস্তুর প্রতীকরূপে অংকিত হতো। পরপর অংকিত কতকগুলি বস্তুর চিত্রের সাহায্যে একটি বক্তব্য বা ভাব প্রকাশিত হতো। মানুষ তার কাজের বৃত্তান্তকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য গুহাচিত্র অঙ্কন করেছে। গুহাচিত্রগুলোর বেশিরভাগই পশু বা পশু শিকার সংক্রান্ত (চিত্র-১)। গুহাচিত্রগুলো আদিম মানুষের মনের কথারই দৃশ্যরূপ হয়ে বিরাজ করছে। ফ্রান্স, স্পেন, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া এবং ভারতে গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।



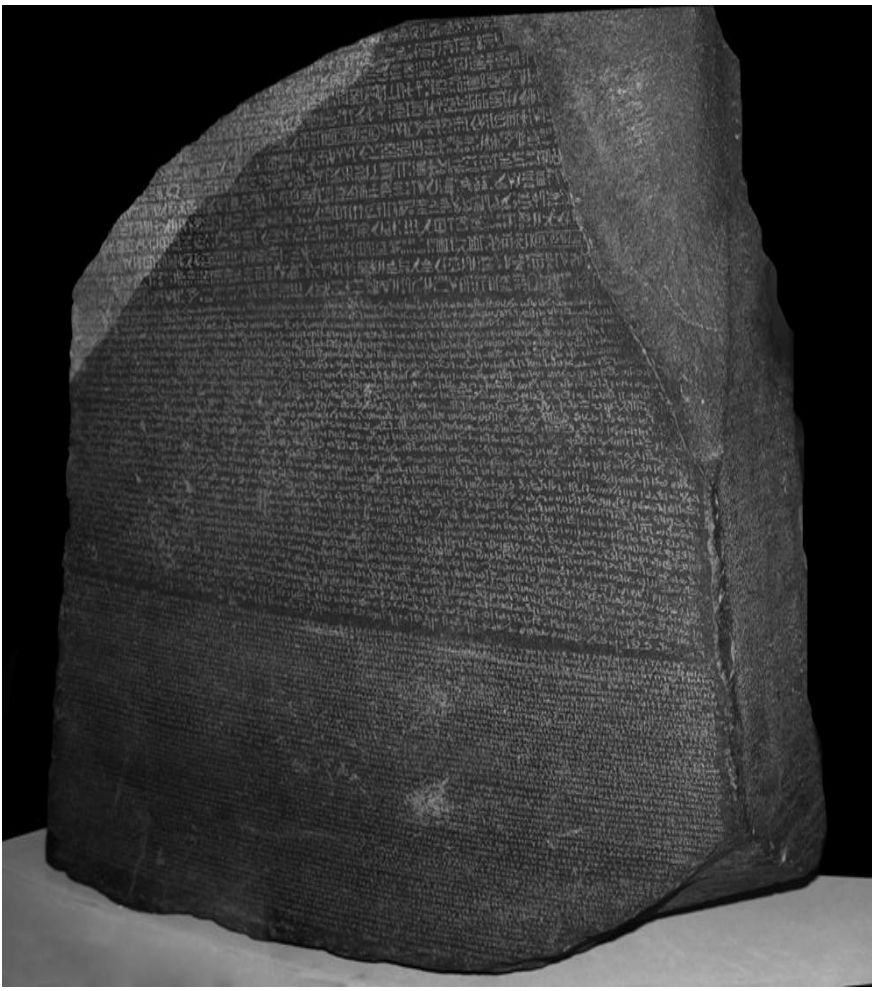
(চিত্র-২)

চিত্র-২ একটি আবেদনপত্র। চিত্রটি বহুকালের পুরাতন নয়। কয়েকশ বছর পূর্বে আমেরিকার সাতটি রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি একমত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদনপত্রটি পাঠায়। চিত্রে প্রতিটি উপজাতির নিজ নিজ টোটেম-প্রতীক এঁকে চোখ ও অন্তরের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। উপজাতীয়দের মুখপাত্র হিসেবে সারস পাখি অঙ্কিত টোটেম জাতিকে দেখানো হয়েছে। আবেদনপত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বিশেষ এক এলাকায় মাছ ধরার অধিকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৩৫)। চিত্র-৩ এ প্রাচীন মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক, হিয়েরেটিক ও ডিমোটিক লিপি দেখানো হয়েছে।



(চিত্র–৩)

মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক বা চিত্রলিপির ব্যবহার মিশরীয় ধর্মযাজকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রিক ভাষা-ভাষীরা এর নাম দেন হায়রোগ্লিফিক বা পবিত্র ভাষা বা দেব ভাষা। হায়রোগ্লিফিক থেকে পরবর্তীকালে হিয়েরেটিক লিপির উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীপর্যায়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী ডিমোটিক লিপির উদ্ভব হয়। উল্লেখ্য, ডিমোটিক পর্যায়ে চিত্রলিপি চিহ্নলিপিতে রূপান্তরিত হয় (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৫৬)। ১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রোজেটা পাথরে (চিত্র-৪) লেখা গ্রিসের রাজা পঞ্চম টলেমির প্রশস্তি রচনা উদ্ধার করা হয়েছে।



(চিত্র-৪)

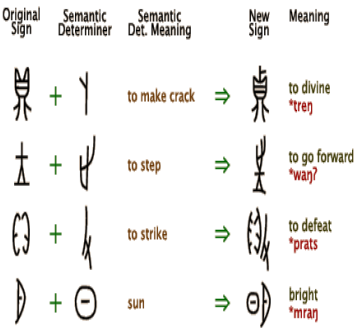
উপরে হায়রোগ্লিফিক, মাঝে ডিমোটিক ও নিচে গ্রিক প্রশস্তি রচনার কারণ হলো, মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক তখন ছিল দেবাক্ষর; প্রশস্তিপত্র দেবাক্ষরে লিখে পুরোহিতরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। শাসকবৃন্দ গ্রিক হওয়ায় গ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং তৎকালীন সাধারণ

মিশরীয়দের জন্য ডিমোটিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছে (লুৎফর, ২০০৫ : ৩৯)। 'রোজেটা' নামক স্থানে শিলা ফলকটি আবিষ্কৃত হয় বলে Rosetta stone নামে শিলা ফলকটি আখ্যায়িত। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বীর নেপোলিয়ান মিশর জয়ের পরে শিলাফলকটি আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীপর্যায়ে, মিশর ইংরেজ শাকদের অধীন হয়। বর্তমানে শিলাফলকটি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৬৬)। ভাষাবিজ্ঞানি ফ্রাঁসোয়া শ্যাম্পোলিয়া মিসরের হায়রোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। গ্রিক লিপির পাশাপাশি হায়রোগ্লিফিক লিপি থাকায়, গ্রিক লিপির সাথে মিলিয়ে চিহ্ন থেকে রানী ক্লিওপেট্রার নাম পড়তে পেরেছিলেন এবং 'রোজেটা' পাথরের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

৪.

দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের হিসাব, রাজার নির্দেশ, ঘটনার বিবরণ, কর্তব্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য প্রাচীন চীন ও পেরু দেশে গ্রন্থিলিপির (Knot Writing) প্রচলন হয়। দড়িতে গিঁট দিয়ে গ্রন্থিলিপি তৈরি করা হতো। দড়ির রকম ও রং, গিঁটের ধরন ও সংখ্যা দেখে কর্তার মনোভাব বুঝতে হতো। যেমন, লাল বর্ণ হলে যুদ্ধ বা স্বর্ণ নির্দেশ করতো, সাদা হলে শান্তি বা রৌপ্য নির্দেশ করতো। পেরুতে গ্রন্থিলিপির নাম কুই পাস বা কুইপু (Quipu বা Quipu Writing) (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৪৪)। উল্লেখযোগ্য, চীনবাসীরা গ্রন্থিলিপি ত্যাগ করে পূর্ববর্তী চিত্রলিপি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে, ইউফ্রেটিস উপত্যকার আদি বাণমুখ লিখন প্রণালী বা মেক্সিকোর পূর্বপ্রান্তের আদি অধিবাসী এজ্‌টেক্‌দের লিখন প্রণালীতে এক একটি বাক্যের জন্য এক একটি চিত্র অঙ্কিত না হয়ে, একটি শব্দের জন্য এক একটি চিত্রের ব্যবহার হতো। প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুগুলির যথার্থ প্রকৃতি অঙ্কন করা হলেও, পরবর্তীকালে চিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়ে সংকেতে রূপ নেয়ায় তা শিক্ষা সাপেক্ষ হয়।

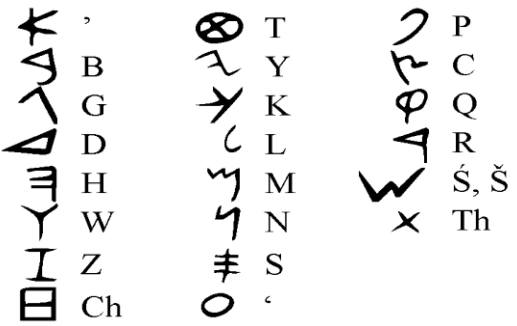
খ্রিষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দের শেষার্ধে, শাং যুগে চীনে প্রাচীনতম লেখনীর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় একই সময়ে সিমাইট জাতি মিশরবাসীদের কাছ থেকে লিপি-বিদ্যা গ্রহণ করে। চীনা শব্দগুলি এখনও ধ্বনিতে বিশ্লিষ্ট হয়নি। চীনাদের প্রত্যেক শব্দই একাক্ষরিক (Monosyllabic)। তাদের লিখন প্রণালীতে প্রতিটি একাক্ষরিক শব্দের জন্য এক একটি পৃথক পৃথক সংকেত ব্যবহৃত হয়। কোনো শব্দের আকৃতি দেখলে প্রথমটির যে অর্থ প্রকাশ পায় তা অক্ষুন্ন রেখে, পরবর্তী বিভিন্ন অর্থ বোঝানোর জন্য সেই সংকেতের সাথে খাড়া, বাঁকা, সমতল, সোজা, তির্যক নানা প্রকারের রেখা সংযুক্ত করা হয়। চিত্র-৫ এ চীনা লিপির উদাহরণ দেখানো হয়েছে।





(চিত্র-৫)

চীনে নানা ভাষা প্রচলিত থাকলেও এক ধরনের লিপি দ্বারা সব ভাষাই লিখিত হয়। সংকেতগুলি কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনিসমূহের প্রতিনিধি নয়। সংকেতগুলি চীন দেশের নানা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাধারণ প্রতিরূপ। যেমন, বিড়াল বাচক চিহ্ন দেখলে বাংলায় বিড়াল, হিন্দি ও উর্দুতে বিল্লি, মারাঠীতে মাঞ্জার, গুজরাতিতে বিলাড়ি, সংস্কৃতে মার্জার, ফারসিতে গুর্বা, ইংরেজিতে ক্যাট, ল্যাটিনে ফেলিস্ ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই লিপি বক্তার মনোভাবের চিত্র, ভাষার প্রতিনিধি নয়। বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল ও ইটালীতে রোমান সংখ্যাবাচক একই অক্ষর ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেক ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম লক্ষণীয়। চীনা লিপি ভাষা-নিরপেক্ষ হওয়ায় বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য। একে ভাবলিপি (Ideograph) বলা যেতে পারে। চিত্র লিখন হতে বা চিত্র হতে উৎপন্ন সাংকেতিক প্রণালী হতে একাক্ষরিক লিখন প্রণালী এবং একাক্ষরিক লিখন প্রণালী হতে বর্ণমূলক লিখন প্রণালীর উৎপত্তি (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২২-২৩)। বর্ণলিপিতে পৌঁছাতে অনেকগুলো স্তর পার হতে হয়েছে। যেমন, গুহাগাত্র ও প্রস্তর ফলক লিপি, চিত্রলিপি, ভাবলিপি, স্বরলিপি ইত্যাদি (কল্পনা, ১৯৯২ : ৩)। এভাবেই লিপি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফিনিসীয় ২২টি বর্ণ (চিত্র-৬) হতে প্রায় সমস্ত লিপিই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়।



(চিত্র-৬)

ফিনিসীয় ২২টি লিপি হতে আরবি, গ্রিক, ল্যাটিন, সিরিলিক ও রুনিক লিপির উদ্ভবের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

Sl.	Reconstruction	IPA	Phoenician	Hebrew	Arabic	Greek	Latin	Cyrillic	Runic
1	*ʾalpu* "ox"	/ʔ/	*ʾālep*	א *ʾāleph*	ا *ʾalif*	A alpha	A	A azŭ	ᚨ *ansuz
2	*baytu* "house"	/b/	*bēt*	ב *bēṯ*	ب *bāʾ*	B bēta	B	В vědě, Б buky	ᛒ *berkanan
3	*gamlu* "throwstick"	/g/	*gīmel*	ג *gīmel*	ج *jīm*	Γ gamma	C, G	Г glagoli	ᚲ *kaunan
4	*daltu* "door" / *diggu* "fish"	/d/, /ð/	*dāleṯ*	ד *dāleṯ*	د *dāl*, ذ *ḏāl*	Δ delta	D	Д dobro	
5	*haw* "window" / *hallu* "jubilation"	/h/	*hē*	ה *hē*	ه *hāʾ*	E epsilon	E	E ye, Є estĭ	

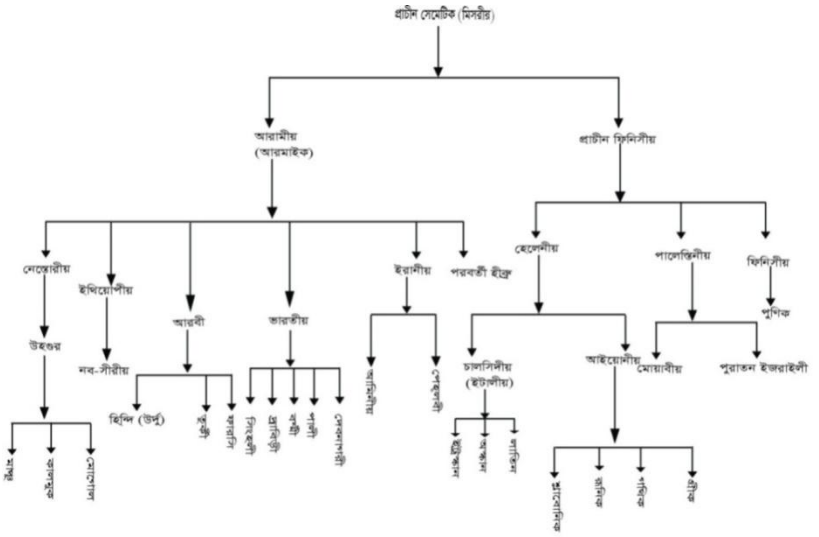
6	*wāwu* "hook"	/β/ or /w/	*wāw*	*vāv*	*wāw*	F digamma, Y upsilon	F, V, Y	Oy / ukŭ → У	Ꙋ *ûruz / *ûram
7	*zaynu* "weapon" / *ziqqu* "manacle"	/z/	*zayin*	*zayin*	*zayn or zāy*	Z zēta	Z	/ З zemlya	
8	*ḥaytu* "thread" / "fence"?	/ħ/, /x/	*ḥēt*	*ḥēṯ*	*ḥā', ḫā'*	H ēta	H	И iže	Ꙉ *haglaz
9	*ṭaytu* "wheel"	/tˢ/, /θˢ/	*ṭēt*	*ṭēṯ*	*ṭā', ẓā'*	Θ thēta		Ѳ fita	
10	*yadu* "arm"	/j/	*yōd*	*yōḏ*	*yā'*	I iota	I	I ižei	І *isaz
11	*kapu* "hand"	/k/	*kap*	*kāf*	*kāf*	K kappa	K	К kako	
12	*lamdu* "goad"	/l/	*lāmed*	*lāmeḏ*	*lām*	Λ lambda	L	Л lyudiye	ᛚ *laguz / *laukaz
13	*mayim* "waters"	/m/	*mēm*	*mēm*	*mīm*	M mu	M	М myslite	
14	*naḥšu* "snake" / *nunu* "fish"	/n/	*nun*	*nun*	*nūn*	N nu	N	Н naší	
15	*samku* "support" / "fish" ?	/s/	*sāmek*	*sāmeḵ*		Ξ ksi, (X ksi)	(X)	Ѯ ksi, (X xěrŭ)	
16	*ʿaynu* "eye"	/ʕ/, /ɣ/	*ʿayin*	*ʿayin*	*ʿayn, ġayn*	O omikron	O	О onŭ	
17	*pu* "mouth" / *piʾtu* "corner"	/p/	*pē*	*pē*	*fā'*	Π pi	P	П pokoi	
18	*ṣadu* "plant"	/sˢ/, /tˢ/	ṣādē	*ṣāḏi*	*ṣād, ḍād*	Ϻ san, (Ϡ sampi)		Ц tsi, Ч črvĭ	
19	*qupu* "Copper"?	/kˢ/ or /q/	*qōp*	*qōf*	*qāf*	Ϙ koppa	Q	Ҁ koppa	
20	*raʾsu* "head"	/r/ or /ɾ/	*rēš*	*rēš*	*rā'*	P rho	R	Р rĭtsi	ᚱ *raidô
21	*šinnu* "tooth" / *šimš* "sun"	/ʃ/, /ɬ/	*šin*	*šin/śin*	*sīn, šīn*	Σ sigma, ς stigma	S	С slovo, Ш ša, Щ šta, / S dzělo	ᛊ *sowilô
22	*tawu* "mark"	/t/, /θ/	*tāw*	*tāv*	*tā', ṯā'*	T tau	T	Т tvrdo	ᛏ *tîwaz

(চিত্র-৭)

চিত্র-৭ এর তৃতীয় কলামে IPA লিপির ব্যবহার করা হয়েছে। IPA হলো আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিমালা (International phonetic Alphabet)। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ধ্বনিতাত্ত্বিক পল প্যাসীর নেতৃত্বে কয়েকজন ব্রিটিশ ও ফরাসি ধ্বনিতাত্ত্বিক আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালা সংঘ

(International Phonetic Alphabet Association) গঠন করেন। মূলত, গ্রিক ও ল্যাটিন বর্ণমালার সহায়তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিমালা নির্ধারণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর সব ভাষা একই লিপিমালার অধীনে নিয়ে আসা। তার ফলে, পৃথিবীর যে কোনো ভাষা যে কোনো ভাষাভাষীর মানুষ পড়তে ও বুঝতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালায় একটি ধ্বনির জন্য একটি মাত্র চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কোনো যুক্ত চিহ্ন নেই। ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির জন্য মোট বর্ণসংখ্যা আছে ১০৭টি, জ্ঞাপকচিহ্ন (Ciacritics) আছে ৩১টি এবং অতিরিক্ত ধ্বনিমূল বোঝানোর জন্য ১৯টি অতিরিক্ত চিহ্ন আছে। এগুলো দিয়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্বর, জোর ও স্বরভঙ্গি জ্ঞাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক ধ্বনিবর্ণমালার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশেষ কোনো ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য না হলেও, কেতাবি অর্থে এ লিপির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বর্ণমালার উদ্ভব সম্পর্কে বর্তমানকাল পর্যন্ত যা জানা যায় তা হলো, খ্রিস্টের জন্মের সহস্র বৎসরেরও পূর্বে ফিনিসীয় বর্ণমালা হতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষার বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। লিপির বংশ তালিকা (চিত্র-৮) উল্লেখ করা হলো :



(চিত্র-৮)

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য বর্ণমালার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য উল্লেখ করেছেন :

- প্রতীচ্য বর্ণমালায় অর্থাৎ, গ্রিক, ইটালীয় ইত্যাদি বর্ণমালায়, ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির প্রতিনিধি স্বরূপ যে যে লিপি থাকে, তা গোটা গোটা আকারের হয় এবং ব্যঞ্জন বর্ণের সম্পূর্ণ অবয়ব থাকে।
- প্রাচ্য বর্ণমালায় অর্থাৎ, হিব্রু, আরবি, নাগরী ইত্যাদি বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় এবং স্বরের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য, কখনও কখনও স্বরের চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। যেমন– বাংলা 'সাবিক', লিখতে 'স' 'ব' 'ক' এই

ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়; কিন্তু 'আ', 'ই' স্বরবর্ণের চিহ্ন লিখিত হয় এবং 'বল' লিখতে 'ব' 'ল' ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ লিখিত হয়; স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। এটি সেমেটিক লিখনের অনুকরণ।

বর্ণমূলক লিপিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার ক্রম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায় :

ভাব প্রকাশক লিপি

- একটি ঘটনার সমগ্র ভাবের চিত্র; যেমন, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।
- পৃথক বস্তু হতে উৎপন্ন ভাবের চিত্র (Ideograph); যেমন– মেক্সিকো এবং মিসরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

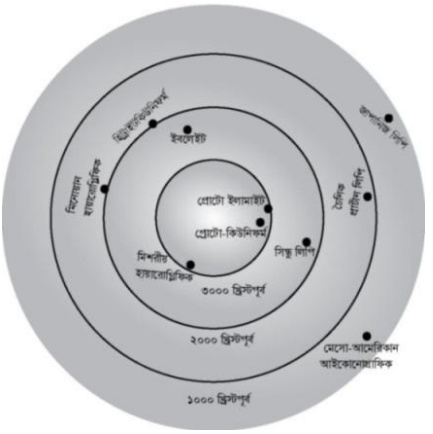
ধ্বনি-প্রকাশক লিপি

- শব্দলিপি (Phonograph) অর্থাৎ, একই চিত্র দ্বারা বহু সমোচ্চারণ শব্দের লিখন; যেমন– চীনের আধুনিক লিপি ও প্রাচীন মিসরের লিপি।
- একটি পদ বা পদাংশের (Syllable-এর) সংকেত দ্বারা লিখনের প্রণালি; যেমন– জাপানী ও সেমেটিক বাণমুখ লিখন প্রণালি।
- বর্ণমূলক লিপির, একটি পদ বা পদাংশের ধ্বনির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় না, কেবল একটি পদের প্রথম ব্যঞ্জন প্রকাশিত হয়; স্বরের কোনো বিশিষ্ট অবয়ব নেই; যেমন– সেমেটিক লিপি।
- বিশুদ্ধ বর্ণমালামূলক লিখন প্রণালি, যাতে প্রত্যেক ধ্বনি প্রকাশের জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন আছে; যেমন– গ্রিক বর্ণমালায়, ইটালীয় বর্ণমালায়, প্রাচীনকালের মিসরীয় বর্ণমালায় এবং পারস্যদেশের বাণমুখ লিখন প্রণালীতে (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২৫–২৬)।

৫.

একটি ভাষা একটি জনপদে হাজার হাজার বৎসর শুধু মুখের ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকতে পারে। এই হাজার হাজার বৎসরে ভাষা শৃঙ্খলায় নানাবিধ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। কোনো কোনো ভাষা মুখের ভাষা হিসেবে বহুকাল প্রচলিত থাকার পর, কোনো এক সময়ে, ভাষাভাষীর সংখ্যার অভাবের কারণে ধীরে ধীরে মৃত ভাষায় পরিণত হতে পারে। আবার কোনো ভাষা লিপিধৃত হলে, সে ভাষা জীবন্ত থাকতে পারে। যেমন, হিব্রু মৃত ভাষা। ইহুদী রাষ্ট্রের প্রভাব ও ইহুদী ধর্মের কারণে হিব্রুর পুনর্জন্ম ঘটেছে। ভাষা মানব সমাজের সাথে সংজ্ঞাপনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম এবং একই সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন। মানব ইতিহাসের অতীতকে বর্তমান, আর বর্তমানকে ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবার একমাত্র ও উন্নততম মাধ্যম ভাষা (আলা উদ্দিন, শায়লা, ২০১৫ : ৭৩)। লিপির মাধ্যমে ভাষাকে ধরে রাখতে না পারলে, ভাষা তার বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা হারাতো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিকশিত মৌখিক ভাষার স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জনপদে লিখন পদ্ধতি গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, লিখন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ যথেষ্ট নমনীয় ও স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এর ফলে, বিভিন্ন ভাষার লিখন পদ্ধতি স্বতন্ত্র ও

নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। লিখন-পদ্ধতির ক্রম নিম্নলিখিভাবে বর্ণনা করা যায় :

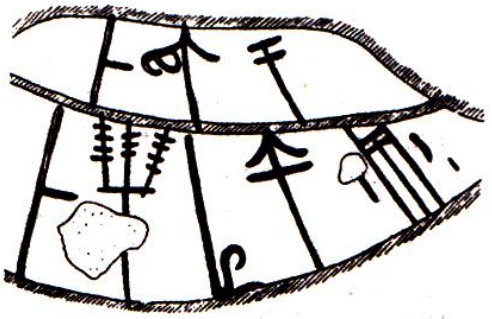


(চিত্র-৯)

Ignace Jay Gelb এর 'Study of Writing' অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ের লিখন পদ্ধতিসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের শুরুর দিকেই লেখার ধারণাটি মেসোপটেমিয়া ও মিশর থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আদি কীলকাক্ষর বা Proto-cuneiform পদ্ধতি চালু হওয়ার পর, স্বল্পকালের জন্য, ইরানীয় মালভূমির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এর ব্যবহার শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর সিরিয়ার এবলা বা ইবলেইট থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, ইবলেইট হলো অধুনালুপ্ত সেমিটিক ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দে উত্তর সিরিয়ার জনগোষ্ঠী সেমিটিক ভাষা ব্যবহার করতো। প্রাচীন শহর ইবলার নামানুসারে এ ভাষার নামকরণ করা হয়। ইবলা বর্তমান সিরিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের দিকে মেসো-আমেরিকায় লেখনীর প্রমাণ পাওয়া যায় (Gelb, 1952 : 212-20)। মেসো-আমেরিকা হলো, মধ্য মেক্সিকো থেকে হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়া অঞ্চল ও সাংস্কৃতিক এলাকা।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে Crete Minoan লেখনী পদ্ধতি শুরু হয়। সেকালের কীলকলিপি বা Cuneiform লিখন পদ্ধতি উত্তরের আনাতোলিয়া প্রদেশেও পাওয়া যায়। ক্রিট (Crete) গ্রিসের বৃহত্তম দ্বীপ। রাজধানী কানিয়া (Canea) বা কানডিয়া (Candia)। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬০ মাইল বিস্তৃত। পৌরাণিক কাহিনীর রাজার (Minos) নামানুসারে পরিচিত ক্রিটের প্রাচীন মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম। ক্রিটে তিন স্তরের ভাবলিপির প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০-১৫৮০ পর্যন্ত হায়রোগ্লিফিক লিপির প্রচলন ছিল এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৫০-১৪০০ পর্যন্ত রৈখিকলিপি-এ (Linear script-A)-এর প্রচলন ছিল। সর্বশেষ, খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫০-১২০০ পর্যন্ত রৈখিকলিপি-বি (Linear Script-B)-এর প্রচলন ছিল। এই তিন ধরনের লিপি ক্রিটানলিপির তিনটি স্তরকেই নির্দেশ

করে (Hrozny, 1953 : 199)। একটি বড়ো পাত্রে লিখিত (চিত্র-১০) ক্রিট লিপির উদাহরণ দেখানো হলো :



(চিত্র-১০)

প্রথম চরণের পাঠ নিম্নরূপ :

 = ta
 = ya
 = na, n

অর্থাৎ, ta-yâ-n(a).

প্রথম ও তৃতীয় চিহ্ন সাইপ্রিয়ান (Cyprian) চিহ্ন এবং মাঝের চিহ্নটি হায়রোগ্লিফিক চিহ্ন প্রভাবিত।

দ্বিতীয় চরণের পাঠ :

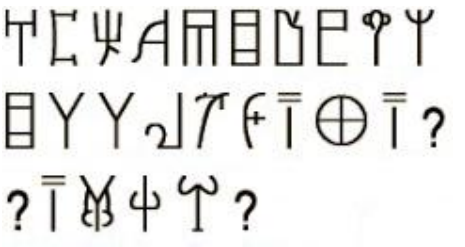
 = ta, t
 = ha, h
 = b, ba
 = yâ

অর্থাৎ t(a)-ha-ba-yâ.

প্রথম চিহ্ন সাইপ্রিয়ান এবং দ্বিতীয় চিহ্ন সাবীয় (sabacan) চিহ্ন প্রভাবিত। তৃতীয় চিহ্ন মিশরীয় পায়ের চিহ্ন অনুরূপ এবং চতুর্থ চিহ্ন প্রথম চরণের দ্বিতীয় চিহ্নের রূপভেদ। পাঠটির শেষে কিছু সমাপ্তিনির্দেশক চিহ্ন রয়েছে। এরূপ চিহ্ন হায়রোগ্লিফিক-'হিট্টাইট', প্রোটো-ইন্ডিয়ান, ব্যাবিলনীয়-কিউনিফর্ম লিপিতেও পাওয়া যায়। এর দ্বারা বিরাট গৃহ বা প্রাসাদ বোঝানো হয়।

ড. বেডরিচ রোজনি (Dr. Bedrich Hrozny) Tayan(a) শব্দটিকে কিউনিফর্ম-হিট্টাইট ভাষার ক্রিয়ারূপ tai-, te-, থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। যার অর্থ, রাখা বা স্থাপন করা। ক্রিটান লিপিতে 'রাখা হয়েছে', 'উৎসর্গ করা হয়েছে' এমন শব্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দ T(a)habaya ক্রিটীয় বা প্রাক হেলেনীয় ধরনের শহরের নাম বলে ধরেছেন। রোজনির মতে,

শব্দটি 'থিবিস' (Thebes) নির্দেশক। ক্রিটিয় Thabaya শব্দটি অনুসর্গ/ai(a) যোগে সম্ভবত, বহুবচনাত্মক রূপ নিয়েছে। শব্দ দুটির পাঠ হলো– Offering of the palace of the city of Thebes. ইলিউসিসের মন্দিরে এই পাত্রে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে পূজা নিবেদন করা হত। এ কারণে পাত্রের এই নাম (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৬৫-৬৬)। ক্রিট লিপির Linear Script-A (চিত্র-১১) এবং Linear Script-B (চিত্র-১২)-এর উদাহরণ দেখানো হলো :



(চিত্র-১১)



(চিত্র-১২)

মনে করা হয়, গ্রিক লিপি লিনিয়ার লিপির তৃতীয় স্তরের। অর্থাৎ, পরিবর্তনের ধারায় লিনিয়ার লিপি পরিবর্তিত হয়ে তৃতীয় স্তরে এসে গ্রিক লিপিতে পরিণত হয়েছে। অ্যালিস কোবার লিনিয়ার বি লিপির গাঠনিক বিশ্লেষণের দিকে নজর দিয়েছিলেন। কোবারের গাঠনিক বিশ্লেষণের ধারণাকে অবলম্বন করে স্থপতি অ্যালিস প্রাচীন গ্রিক লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

৬.

মানব সভ্যতা, শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে লিপির সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্য, সভ্যতার প্রাচীন পর্বের বিষয়াবলি লিপির আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসকে উন্মোচিত করেছে। ইউরোপীয় মনীষীরাই প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এক্ষেত্রে, প্রিন্সেফ এবং অন্যান্য পণ্ডিত কর্তৃক ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত (গৌরীশঙ্কর, ১৯৮৯ : উপক্রমণিকা)। আমরা লক্ষ করি, খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে মিশর, বাবিরুস (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশে তামার নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড়রা বাবিরুষ দখল করে বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বাবিরুস ও আসুরের প্রাচীন অধিবাসীরা সেমিটিক জাতীয়। ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি, এই আদিম অধিবাসীদেরকে পরাজিত করে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সুমেরীয়রা প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্তা (রাখালদাস, ২০১২ : ১৬)।

মধ্য ভারতের পার্বত্য উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তরনির্মিত কীলক আবিষ্কৃত হয়েছে। কীলকটি ভারতের নাগপুরের মিউজিয়ামে আছে। কীলকাক্ষরে একটি খোদিত লিপি আছে এবং কীলকটি বাবিরুষের প্রাচীন মুদ্রা (Cylinder Seal)। প্রাচীনকালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (সিলমোহরের) বহুল প্রচলন ছিল (রাখালদাস, ২০১২ : ১৭)। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত হিউগো উইঙ্কলার (Hugo Winckler) তুরস্কের বোগজকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে (Cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নি রাজগণের কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টের জন্মের ২০০০ বছর পূর্বে আর্যজাতি এশিয়ার মধ্যভাগের মরুময় আবাসভূমি ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। আর্যদের আক্রমণে, খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর পূর্বে বাবিরুস ও মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্যবংশজাত কাশীয় জাতি (Kassites, Cossites Kush-Shu) বাবিরুষ দখল করে নতুন রাজ্য স্থাপন করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম সূর্য্যস এবং আর্য জাতিসমূহের অনুরূপ ভাষা ছিল। কাশীয়দের পবন দেবতার নাম মরুত্তম (সংস্কৃত মরুৎ) এবং তারা খোদিতলিপিসমূহে নিজেদের আর্যনামে অভিহিত করতেন। প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) থেকে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) বৎসরকাল যাবৎ আর্য ভাষা গোষ্ঠী টিকে আছে এবং পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো ভাষা গোষ্ঠী হলো আর্য ভাষা গোষ্ঠী (রাখালদাস, ২০১২ : ১৩)।

সংস্কৃতে আর্য শব্দের অর্থ সদ্‌বংশজাত ব্যক্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০), ইংরেজ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৮৬-১৭৯৪) প্রমুখের মতে আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। বেদ হলো আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। বেদ প্রথমে লিখিত আকারে ছিল না। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলো প্রথম রচিত হয় এবং শ্রুতি বা কানে শুনে স্মৃতি বা আবৃত্তির মাধ্যমে বহুকাল বংশ পরম্পরায় থেকে যায়। ঋগ্বেদে আফগানিস্তানের কাবুল ও স্বাত, পাঞ্জাবের শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগ, বিপাশা, ঝিলাম, সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে এবং প্রথমে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর্যরা আফগানিস্তান সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 'সপ্তসিন্ধু' আখ্যা দিয়েছিল। বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র পাঞ্জাব থেকে মধ্যদেশ বা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় সরে আসে। বৈদিক উৎসগুলোতে দুটি সাগর, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করেনি।

ভারতের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতাকে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। স্যার জন মার্শালের মতে, 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দের অর্থ মৃতের স্তূপ। স্যার মার্টিমার হুইলার এবং ম্যাকের (Mackky) মতে, বিদেশি আর্যরা ভারতে ঢুকে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো 'পুর' বা নগরকে ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন বলে তার নাম 'পুরন্দর'। 'পুরন্দর' শব্দের বৈদিক অর্থ, হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা।

অন্যদিকে, বালগঙ্গাধর তিলক "অস্টিক হোম অব্ দ্যা বেদ্‌স" গ্রন্থে লিখেছেন, আর্যরা ভারতীয়। বালগঙ্গাধর এবং অধ্যাপক জেকোবির মতে, ভারতের বৈদিক সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার চেয়ে অন্তত দু'হাজার বছর আগের এবং সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা নয়, বৈদিক সভ্যতারই অংশ। 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দের অর্থ "মহা-ইঞ্জ-দাড়ো"। সংস্কৃত ভাষায় 'ইঞ্জ' ধাতুর অর্থ সংকেত বা নির্দেশ দেয়া এবং 'দাড়ো' শব্দের অর্থ দুর্গ। অর্থাৎ, "মহেঞ্জোদাড়ো" শব্দের অর্থ হলো, সেনাছাউনি বা দুর্গ।

যজ্বাবতী নদীর তীরে হরিয়ূপীয়া নামক স্থানে আর্যদের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে আর্যদের সেনাপতি ছিলেন চায়মান এবং বিরোধীপক্ষ দাসদের সেনাপতি ছিলেন বর্চিনদাস। বর্চিনদাসের ১ লক্ষ ৫ জন সৈন্য ছিল। অগ্রভাগে বরশিখ বংশোদ্ভূত ৩ হাজার দুর্ধর্ষ বৃচিবন যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধে আর্য সেনাপতি চায়মানের শতঘ্নী ও সূমী অস্ত্রের আক্রমণে বৃচিনরা পরাজিত হয়।

সংস্কৃত "যজ্ব" শব্দের প্রতিশব্দ হলো "হ্ব-র" যার অর্থ স্রোত। যজ্বাবতীর নাম "হ্বরবতী" যা বর্তমানে 'ইরাবতী'। এই ইরাবতীর পশ্চিম তীরেই বর্তমান মন্টোগোমারী জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে হরপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এলাকার অধিবাসীরা হরিয়ূপীয়াকে 'হরপ্পা' বলেন।

ঋগ্বেদের বিবরণ : "এতত্যক্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীবর্বরশিখস্য শেষঃ।

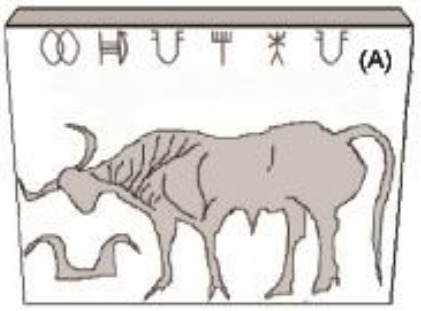
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্ম্যাৎস্বনাচ্চিদিন্দ্রপরমো দদার।।

বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোহভ্যাবর্তিনে চায়মানয় শিক্ষন্।

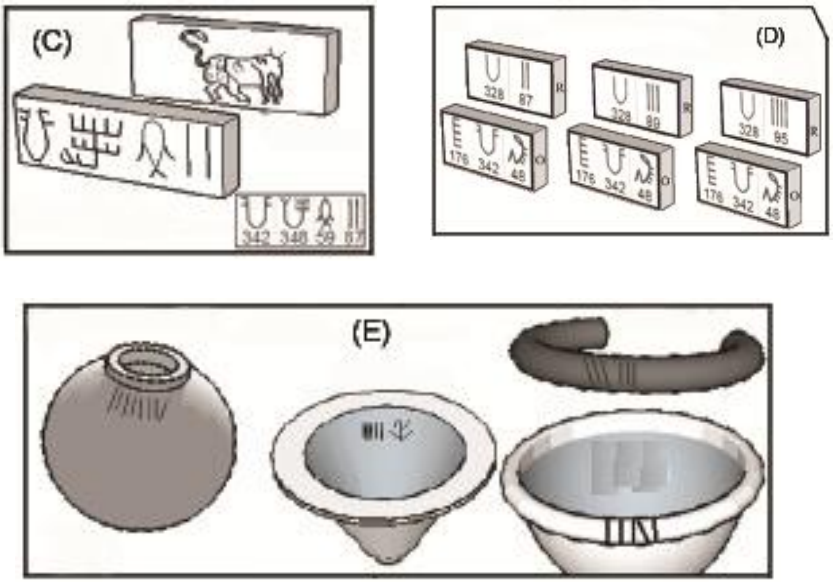
বৃচীবতো যদ্ হরিয়ূপীয়ায়াম হন্ পূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্তন।।" (ঋগ্বেদ ৬/২৭/৪,৫)

সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি। তবে, বাঙালি মেয়ে, কার্টুনিস্ট, টেনিস ও ফ্যাশনে আগ্রহী, কবি এবং পেশায় আইটি বিশেষজ্ঞ বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় রচিত "Interrogating Indus inscriptions to unravel their mechanisms of meaning conveyance" শীর্ষক ৩৭ পৃষ্ঠার গবেষণা প্রবন্ধটি বিখ্যাত নেচার ব্রান্ডের পত্রিকা 'প্যালগ্রেভ কমিউকেশন্স'-এর পঞ্চম ভলিউমে ৭৩ নম্বরে প্রকাশিত হওয়ায় সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

সিন্ধু লিপি (চিত্র-১৩)-কে প্রধানত শব্দচিত্রের মাধ্যমে লিখিত একটি লিপি বলে মনে করেন বহতা। সিন্ধু লিপিতে উৎকীর্ণ সিলমোহর আর মৃৎ-ট্যাবলেটগুলো বর্তমানকালের স্ট্যাম্প, মুদ্রা, টোকেন ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। মুদ্রার বা স্ট্যাম্পের বিশেষ বিশেষ অংশে যেমন বিশেষ বিশেষ তথ্য দেয়া থাকে, ঠিক সে রকমই এগুলোর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরনের বা শ্রেণির শব্দচিত্র থাকে যা Fuctionally এক রকমের। এই উৎকীর্ণ সিলমোহর আর লিপিফলক Formalized Data Cariars, যার মধ্যে 'Document Specific Syntax' আর 'Linguistic Syntax', এই দুই রকমের Syntax বা গঠনপদ্ধতি দেখা যায়।







(চিত্র-১৩)

[চিত্র-১৩ : A-তে মহেঞ্জোদাড়োর খোদাই করা সিলমোহর, B-তে হরপ্পার সিলমোহর, C-তে মহেঞ্জোদাড়োর তামার টেবিল, D-তে হরপ্পার তিন জোড়া অনুচিত্র, E-তে ৪টি খোদাই করা মৃৎশিল্প দেখানো হয়েছে।]

বহতার মতে, শব্দচিত্রলিপিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Rebus Principle ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, 'মা' বোঝাতে শিশু কোলে মায়ের ছবি দেয়া হলো। আবার 'খা' বোঝাতে একটি মানুষের খাওয়ার ছবি দেয়া হলো। দুটি শব্দচিত্রই তাদের অন্তর্নিহিত অর্থকে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুললো। এবার যদি 'মাখা' লিখতে হয়, তা হলে তার জন্য নতুন শব্দচিত্র উদ্ভাবন না করে, মা এবং খা-এর জন্য ব্যবহৃত দুটি শব্দচিত্রকে পাশাপাশি বন্ধনী দিয়ে জুড়ে দেয়া হলো (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩/৯/২০১৯)।

বহতা মনে করেন, সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), দেহতত্ত্ব (Physiology), শব্দ বিজ্ঞান (Acoustics Science), ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics), গণিত (Math), পুরাতত্ত্ব (Archeology), ইতিহাস (History), প্রাচীন সভ্যতার অর্থনীতি (Old Historical Economics), কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science) এবং সর্বোপরি সাধারণজ্ঞান (Overall Commonsense) প্রয়োজন। সিন্ধু সভ্যতার লোকজন ভীষণভাবে বাণিজ্যধর্মী ছিল। সিন্ধু লিপি ও সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে দেড়শ বছর ধরে। সিন্ধু লিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন জ্ঞান শাখার প্রায় ১০০ জন গবেষক দাবি করেছেন, যে তাঁরা সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করে ফেলেছেন। তবে তাঁদের একজনের কথাও গবেষক সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়নি (দৈনিক প্রথম আলো, ৩০/১০/২০১৯)। বহতা অংশুমালী কর্তৃক সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

৮.

১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ড. স্পুনার (Dr. D.B. Spooner) পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা (Terracotta Plaque) আবিষ্কার করেছিলেন। এই মুদ্রায় মহাবোধি বিহারের প্রকৃতি এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে (রাখালদাস, ২০১২ : ২৬)। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম লিপি হলো খরোষ্টি ও ব্রাহ্মী লিপি। পাকিস্তানের 'শাহবাজগঢ়হি' ও 'মান্ সেরা'য় অশোকের দুটি অনুশাসন লিপিতে খরোষ্টি লিপির ব্যবহার দেখা যায় (কাইউম, ২০০ : ১৫৬)। ১৮৮০ হতে ১৮৯২ পর্যন্ত জে.ডি.এম বেগলার মহাবোধি মন্দির খনন ও সংস্কারকালে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি বোধিসত্ত্ব মূর্তি আবিষ্কার হয়। এই মূর্তির পাদপীঠে একটি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির অক্ষরসমূহ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির অক্ষরের অনুরূপ (রাখালদাস, ২০১২ : ২৬-২৭)।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ২১০০টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত মাইক্রোনেশিয়া। এর পশ্চিমে ফিলিপাইন, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণে পাপুয়া নিউগিনি ও মেলানেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বে পলিনেশিয়া অবস্থিত। মাইক্রোনেশিয়ার অন্যতম একটি দ্বীপ 'ইয়াপ'। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানে 'পাথুরে শিলা মুদ্রা' প্রচলিত রয়েছে (চিত্র-১৪)।



(চিত্র-১৪)

কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে সাত মিটার ব্যাসের মুদ্রাও এখানে রয়েছে। মূলত বড়ো কোনো লেনদেন, বিয়ের উপহার, ক্ষতিপূরণ দেয়ার মতো পরিস্থিতিতে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালে, মুদ্রার জায়গা মার্কিন ডলার দখল করলেও পাথুরে শিলা মুদ্রার কদর এখনো আগের মতোই রয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮/০৫/২০১৮)।

পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলায়, শুশুনিয়া পর্বতে চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আছে, তা হতে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম সিংহবর্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটে মসজিদ কুতুব-উল-ইসলামের অঙ্গনে একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে। লৌহস্তম্ভের গায়ে যে, প্রাচীন খোদিতলিপি আছে, তা থেকে জানা যায়, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিষ্ণুপাদ গিরিতে বিষ্ণু ধ্বজ স্থাপন করেছিলেন এবং বঙ্গে সিন্ধুর সপ্তমুখের পারে ও বাহ্লীক দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। শুশুনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবর্মা ও দিল্লির লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি; এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্মা তাঁর ছোটো

ভাই। চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গদেশ হতে বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্যবর্ত জয় করেছিলেন। এলাহাবাদের দূর্গের মধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাতে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামক জনৈক আর্যবর্তরাজকে বিনষ্ট করেছিলেন। সমুদ্রগ্রপ্তের প্রশস্তির ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা এবং দিল্লি স্তম্ভলিপির চন্দ্র অভিন্ন (রাখালদাস, ২০১২ : ২৭-২৮)। কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব রাজা খারবেলের একটি দীর্ঘ শিলালিপি ভারতের পুরি জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকটে উদারগিরি পর্বতের হাফিগুম্ফা নামক একটি গুহার উপরে উৎকীর্ণ আছে। এসব নিদর্শন হতে প্রাচীন লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

মানব মনের প্রস্ফুটিত মাধুর্য সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যে সংগীত লিপিধৃত হয়, সে সঙ্গীত যুগের পর যুগ বেঁচে থাকে। সঙ্গীতের জন্মভূমি সম্ভবত, সিরিয়ায়। ১৯৫০ এর দশকে সিরিয়ায় সংগীত সংক্রান্ত ২৯টি নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলো ৩ হাজার ৪০০ বছরের পুরোনো। এদের একটিতে মাটির খণ্ডের উপর অনেকটা আধুনিক যুগের সুরলিপির মতোই সংগীতের সুরলিপি অঙ্কন করা আছে। এগুলো খণ্ড খণ্ড অবস্থায় থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রায় ২০ বৎসর চেষ্টার পর জোড়া লাগিয়ে একটি গানের পূর্ণ লিপি বের করতে সক্ষম হন (চিত্র-১৫)।



(চিত্র-১৫)

এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম স্বরলিপির নিদর্শন। গবেষক দলের একজন ইরাকের ব্যাবিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক রিচার্ড ডামব্রিল বলেন, অনেকের ধারণা হাজার হাজার বৎসর আগে কেবল ধর্মীয় গানই গাওয়া হতো। কিন্তু, বিষয়টি তেমন নয়। একটি গানের কথায় দেখা গেছে, একজন বার গার্ল তার খরিদ্দারের উদ্দেশ্যে গান গাইছে। আরেকটি গানের কথায় দেখা যায়, একজন নারী সন্তান না হওয়ার জন্য গান গাইছেন। তার ধারণা তিনি হয়তো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন, সেজন্য, সৃষ্টিকর্তা রুষ্ট হয়ে তাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন। এরকম থিমের উপর গান রচিত হতো। এছাড়াও, ৩ থেকে ৪ হাজার বৎসর পূর্বের বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শনও সিরিয়ায় পাওয়া গেছে। ড্রামবিল বলেছেন, মানব জাতির প্রথম গানটি সিরিয়ায় উদ্ভব

হয়েছিল কি-না তা নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৯/০৫/২০১৮)।

৭.

লিপির উৎপত্তি পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায়, আধুনিক ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষরমূলক লিপিগুলি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এগুলি আবহমানকালের মানুষের মানসকৃতির (Intellectual Activities) প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। বাক্যনির্ভর গুহাচিত্র থেকে চিত্রলিপি (Pictogram), চিত্রলিপি থেকে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ সক্ষম ভাবলিপি (Ideogram), এরপর বস্তুর প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত বা সাংকেতিক হয়ে শব্দলিপির (Logogram) উন্মেষ ঘটে। লিপি বিবর্তনের ফলে, বস্তুচিত্র একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে শব্দলিপিতে পরিণত হয়েছিল। এক্ষেত্রে, ঐ বিশেষচিহ্ন এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুচিত্রের সঙ্গে কোনো মিল থাকেনি। ভাষার প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে চিহ্নের ব্যবহার শব্দলিপির বৈশিষ্ট্য, যা পরবর্তীকালের অক্ষরলিপি (Syllabogram)-কে নির্দেশ করতো। একীভূত শব্দগুলি কালক্রমে গঠনগত (Physiological) দিক থেকে অক্ষর (Syllable)-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। তবে, শ্রুতিগত (Acoustic) দিক থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকেই নির্দেশ করেছে (শাহজাহান, ১৯৮৪ : ২৮–২৯)।

লিপি সৃষ্টির সাথে সরাসরি প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সবগুলো ভাষারই যে লিপি আছে, তা নয়। যেসব ভাষা লিপিধৃত হয়নি, সেসব ভাষা প্রযুক্তির ছোঁয়া পায়নি। সভ্যতার ইতিহাসে লিপি তৈরি প্রথম প্রাযুক্তিক পদক্ষেপ। লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর সমগ্র পৃথিবীর জীবনযাত্রায় বড়ো রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষ হাজার হাজার বৎসর ধরে গুহালিপি, প্রস্তরলিপি, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, ভূর্জপত্র, তালপত্র, বৃক্ষবাকল, পশুর চামড়া, শিং, দাঁত ইত্যাদিতে ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে (মনসুর, ২০১৭ : ১৭৫)। লিপির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য যুগের পর যুগ মানুষ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের ভিত্তিতে হায়রোগ্লিফিক, কিউনিফর্ম, ক্রিটান, ফিনিশিয়ান এবং আরো অনেক লিপি একেক সময় একেক জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রথম লিপি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে (The Encyclopedia Americana, 1896 : 618–19)।

তবে, এ যাবত প্রাপ্ত লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গুহাচিত্র এবং শিলালিপি অতিপ্রাচীনকালের নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে। যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প, ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে অনেক প্রসিদ্ধ মানব সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য, ধারাবাহিক মানব সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া বেশ দুষ্কর। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন সবকিছুই লিপিধৃত হওয়ায় যুগের পর যুগ মানবসভ্যতা টিকে আছে। পূর্ববর্তী মানুষের অর্জন ও সৃষ্টির বিষয়াদি লিপিধৃত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালের মানুষের জীবন-যাত্রা সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক হয়েছে। কে, কখন, প্রথম লিপি উদ্ভাবন করেছিল, তা সঠিক ভাবে জানা যায় না; যেমন, জানা যায় না, কখন, ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক উপযোগিতা পাওয়ার জন্যই মানুষ লিপি উদ্ভাবন করেছে। ভাষা ও লিপির ব্যবহার চলমান প্রক্রিয়া। লিপির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার মনোভাব লিপি ফলকে অঙ্কিত করে রাখতে পারে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে একই ভাষার লিপির বিভিন্নরূপ

লক্ষ করা যায়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার লিপির স্থায়িত্ব ও অভিন্ন রূপ নিশ্চিত করেছে এবং ভাষার মানরূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সেজন্য, লিপির উৎপত্তি ভাষা ও মানব সভ্যতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

সহায়কপঞ্জি

আলা উদ্দিন, শায়লা শারমিন (২০১৫)। 'জৈবিক ভিত্তি ও সামাজিক সংযোগ : প্রেক্ষিতে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৯৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এস. এম. লুৎফর রহমান (২০০৫)। *বাঙালা-লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কল্পনা ভৌমিক (১৯৯২)। *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খন্দকার মুজাম্মিল হক (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা (১৯৮৯)। *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা*, মণীন্দ্র নাথ সমাজদার (অনু.)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (২০০৩)। *বর্ণমালার উদ্ভববিকাশ ও লিপি সভ্যতার ইতিবৃত্ত*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাক (২০১৮)। সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ (২০১৯)। সম্পাদক : এম. এ. খান মাসুদ, গ্লোব প্রিন্টার্স লি. ও জনকণ্ঠ লি. ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৯)। সম্পাদক : মতিউর রহমান, ঢাকা।

নলিনী সান্যাল (১৯৮৫)। 'ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ'। *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড। সম্পাদক : হুমায়ুন আজাদ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মনসুর মুসা (২০১৭)। *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর*। মধ্যমা মিডিয়া অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (১৯৮৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*। গতিধারা, ঢাকা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস* (অখণ্ড সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

Bedrich Hrozny, (উদ্বৃত, খন্দকার মুজাম্মিল হক, ২০০০) Translated by Indirich Prochazka (1953), *Ancient History of western Asia, India and Crete*. New .

Ignace Jay Gelb (1952). *A study of writing : The Foundations of Grammatology*. University of Chicago Press, Chicago.

The Encyclopedia Amercana (1996). International Edition, Grolier Incorporated, USA.